১৬ অক্টোবর সংবাদমন্থন প্রকাশিত হয়নি

দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো এবং বকরি-ঈদের কারণে কলেজ স্ট্রীট পাড়ার সমস্ত প্রেস ১০ থেকে ২০ অক্টোবর অবদি বন্ধ ছিল। তাই ইচ্ছা থাকলেও ১৬ অক্টোবরের সংবাদমন্থন প্রকাশ করা যায়নি। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এখনও অবদি এই প্রথম সংবাদমন্থনের কোনও একটি সংখ্যা বেরোলো না। তাই এবারের সংখ্যা যৌথ ৮-৯ সংখ্যা।

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

Vol 5 Issue 8-9 1 November 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

পঞ্চম বর্ষ অষ্টম-নবম সংখ্যা ১ নভেম্বর ২০১৩ শুক্রবার ২ টাকা

• আলুর দাম পৃ ২ • সংবাদ সংলাপ পৃ ২ • কেদারনাথ ঘুরে পৃ ২ • ইজ্জত মান্থলি পৃ ৩ • মোটরবাইক পৃ ৩ • শিশু মেলা পৃ ৪ • তিব্বত পৃ ৪ • অসুর পৃ ৪

হোর্ডিং টাঙাতে সবুজ নিধন

কলকাতায় দুর্গাপুজো উপলক্ষে বিজ্ঞাপণের হোর্ডিং লাগানোর জন্য হাজার হাজার গাছ কাটা হয়েছে, ডাল কাটা হয়েছে। যাদবপুর থানার শমীক সরকারের তোলা ছবি, ৯ অক্টোবর।

ষোলোবিঘা জলে ডুবে আছে

৩১ অক্টোবর, খায়রুন নেসা, ষোলোবিঘা, মহেশতলা • পুজোর মধ্যে বৃষ্টি হল। তারপর ঈদ যেতেই আবার একচোট ভারী বৃষ্টিতে বহু এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। মহেশতলার নিউ আলিনগরে জল এখনও নামেনি, নুরনগরে অবস্থা একটু ভালো। মাকালহাটি, সুন্দরনগর, পিএম লেনে ঘরে জল উঠেছিল। পাঁচুড়ের ড্রেনগুলো জাম হয়ে আছে প্লাস্টিক আর রাজ্যের ময়লায়।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ষোলোবিঘা বস্তিতে। এলাকার বেশ কিছু অংশ জলে ডুবে আছে। সেখানে ঘরের ভিতরের জল নামছে না। সেই কারণে বাচ্চাদের ইস্কুল বন্ধ। ঘরে ঘরে আন্ত্রিক আর পেটের রোগ। এত মশার উপদ্রব যে ম্যালেরিয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। যে তিনটে নতুন টিউবওয়েল লাগানো হয়েছিল তার মধ্যে দুটোর গোড়ায় জল ভর্তি। ছোটো ছোটো বাচ্চাদের ঘরে রেখে মায়েদের কাজে বেরোনোও মুশকিল। যেখানে জল নেমে গেছে, সেখানেও স্যাঁতসেঁতে ভাব। খাটা (কুয়ো) পায়খানাগুলো জলে ডুবে থাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে চারদিকে।

আকড়া ফটকের নয়াবস্তি জলে ডুবে নেই। কিন্তু ওদের জলকষ্ট মেটেনি। জলের আর পায়খানার অভাবে যত ধরনের রোগ সব রয়েছে এখানে। ইদানীং রাবিশ আর ভাঙা ইট দিয়ে একটা রাস্তা হয়েছে। ইটভাটার মালিক, কাউন্সিলারকে ধরাধরি করে সকলে মিলে রাস্তাটা করে নিয়েছে। ইটভাটার গাড়িগুলো যায়।

অযন্ত্রচালিত যান নিষেধের বিরুদ্ধে ‘চক্র সত্যাগ্রহ’ কলকাতার সাইকেল-রিকশা-ঠেলাজীবীদের

চক্র সত্যাগ্রহের জমায়েতের ছবি শমীক সরকারের তোলা, ২ অক্টোবর ২০১৩

শমীক সরকার, কলকাতা, ২ অক্টোবর • আজ গান্ধী জয়ন্তীতে কলকাতা দেখল কয়েক হাজার টানা রিকশা, রিকশা, ঠেলাগাড়ি ও সাইকেলজীবীর জমায়েত। সকাল দশটা থেকে শুরু হয়েছিল জমায়েত। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে যাদের জীবিকা নির্বাহ হয়, তারা আসতে থাকে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, কেউ দল বেঁধে সাইকেল নিয়ে। কেউ বা আবার ম্যাটাডোরে করে। হাতে ছিল পোস্টার ‘চক্র আমাদের জীবন’। ঠেলা, রিকশার চেয়ে সাইকেলজীবীদেরই জমায়েত বেশি চোখে পড়লো। অনুষ্ঠানে কোনও মাইক বাজেনি। চৌরঙ্গীর স্টেটসম্যান হাউস / ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে একজন বাউলের গান ‘সাইকেলের দু-দিকে চাকা মধ্যে ফাঁকা’ এবং ছোট্ট পথ নাটিকায় কলকাতার রাস্তায় নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া সাইকেল-রিকশা-ঠেলা প্রভৃতির পুনরুত্থানের কাহিনী — এই নিয়েই ছিল আজকের অনুষ্ঠান। অনেকেই মুখে কালো বা সাদা কাপড় বেঁধে এসেছিল। কথা ছিল — এই ‘চক্র সত্যাগ্রহ’ হবে নীরব প্রতিবাদ — – কলকাতা শহর থেকে সাইকেল-রিকশা-ঠেলা প্রভৃতি যন্ত্রবিহীন যানবাহনকে যেভাবে ধীরগতির যান বলে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে — তার বিরুদ্ধে।

ওই চৌরঙ্গী এলাকাটি থেকে রোজ পেপার তুলে ভবানীপুরে ফিরি করতে নিয়ে যান প্রেম শঙ্কর দুবে। তিনি বললেন, প্রতি মাসে তাদের প্রত্যেককে ২০০ টাকা গুণ্ডা ট্যাক্স দিতে হয় পুলিশ-কে। এখন নতুন এখানকার দায়িত্বে এসেছে, আলম নামে একজন অফিসার — সে নির্লজ্জ। নিজের পকেটে সেই টাকা ঢোকায়। আগের কমিশনার বলত, ওই ফলওয়ালাকে দে, ওই দোকানদারকে দে। নিজের পকেটে ঢোকাতো না। প্রতি মাসের ১-২ তারিখ হলেই তাগাদা দিতে থাকে টাকাটা দেওয়ার জন্য। না দিলেই ধরবে। কিন্তু কাগজওয়ালাদের তো শুধু সকালে কাগজ নিলে চলে না, বিকেলের কাগজের জন্য নিষেধের সময়সীমার মধ্যে (সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা) এই এলাকায় সাইকেল নিয়ে আসতে হয়।

দুবেজি আরও বললেন, সপ্তাহ দুয়েক আগে নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে চৌরঙ্গী থেকে প্রেস ক্লাব অবদি যে মিছিল হয়, তাতে উপস্থিত ছিল চিৎপুরের জনা চল্লিশেক দুধওয়ালা। হিন্দি সংবাদপত্র প্রভাতখবর প্রভৃতিতে তাদের ছবিও বেরিয়েছিল। সেই অপরাধে এই দুধওয়ালাদের বেছে বেছে পুলিশ ধরেছে, সকাল সাড়ে সাতটায়। তাদের দুধের পাত্র ফেলে দিয়েছে রাস্তায়।

একজন দুধওয়ালা দুধের বালতি শুদ্ধ সাইকেল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন সত্যাগ্রহে। তিনি জানালেন, আজই হাওড়া ব্রিজের কাছে একজন সাইকেল আরোহী পুলিশের ভয়ে পালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। তার ঘাড় পিঠে চোট লেগেছে।

চক্র সত্যাগ্রহের উদ্যোক্তা ছিল বেশ কিছু অসরকারী সংগঠন, যেমন গ্রীনপিস, রাইড টু ব্রিদ, সুইচ অন, ডবলু ডবলু এফ প্রভৃতি এবং কিছু ইউনিয়ন, যেমন পশ্চিমবাংলা আকবর বিক্রেতা সমিতি, হ্যান্ড কার্ট ইউনিয়ন। উপস্থিত ছিল সাইকেল সমাজ এবং কলকাতা সাইকেল আরোহী অধিকার ও জীবিকা রক্ষা সমিতি।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীরব প্রতিবাদের সীমা অতিক্রম করে সাইকেল-রিকশা-ঠেলাজীবী মানুষেরা সরবে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। বেলা ১২ টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়

এবারের দুর্গাপূজার শেষটা ভালো হলো না ...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য, কোচবিহার, ১৮ অক্টোবর •

এবারের দুর্গাপূজার শেষটা ভালো হলো না। এ কথা সত্যি যে আমাদের দেশে চারজন মানুষের মৃত্যুটা কোনো ব্যাপারই নয়; মানুষ বেশি, মানুষের মরে যাবার ব্যাপারটাও জলভাত। তবুও পরদিন খবরের কাগজে যাদের হঠাৎ করে মরে যাবার কথা প্রকাশ হলো, তারা কোনো না কোনো ভাবে আমার চেনা। আর সেজন্যই হয়ত এই চারটে মরে যাওয়া নিয়ে বেড়িয়ে এলো দোমড়ানো মোচড়ানো কিছু কথা।

বাড়ি থেকে দুপা হাটলেই ওদের বস্তি। ওখানকারই মানুষ শম্ভু রিক্সাওয়ালা আর তার মা, সুনীল গাছ কাটিয়ে আর তার বউ। শম্ভু নবমীর দিন আমাদের ঠাকুর দেখতে নিয়ে গিয়েছিল। ২৪-২৫ বছরের একটা উঠতি ছেলে। আমার বাবা বিয়ে কবে করবি জিগ্গেস করতেই,ওর মুখে একটা লজ্জাওয়ালা হাসি।

রেলের জমিতে এদের বছরের পর বছর ধরে বসবাস। ট্রেন ব্যাপারটা যেন ওদের জীবনের একটা রোজকার অংশ। ট্রেন থেকে দুহাত দুরে ওদের রান্নাঘর, শোবারঘর। ট্রেন লাইনের পাশেই জন্ম, স্নান, খাওয়া, ভালবাসা আর মরে যাওয়া। এই মরে যাবার ব্যাপারটা যে সবকিছুর থেকে বেশি করে সে রাত্তিরে সত্যি হয়ে উঠবে, তা বোধ হয় ওরা কোনদিনও ভাবে নি।

কাল রাতটা বিজয়া দশমীর ছিল না। কিন্তু কাল রাতে ছিল দুর্গাঠাকুরের ভাসান। ছিল লম্বা প্রশেসান, দুদিন ধরে অবহেলায় পড়ে থাকা মূর্তিটা নিয়ে শেষ আনন্দটুকু লুটে নেবার আপ্রাণ প্রয়াস। ছিল অনেক আলো, ঘামে ভেজা অনেক শরীর, অনেক ধরনের গন্ধ। কিছু সচেতেনতা আর অসচেতনার মাঝে আর ছিল এক ট্রাক ভর্তি সাউন্ড বক্স আর তার থেকে বেড়িয়ে আসা সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে, ছড়িয়ে পরা আওয়াজ। এবারের পুজোর মূল আকর্ষণ ছিল ডিজে-র বাজনা। বোকা মানুষগুলো জানতই না, এই আওয়াজের ছলে এসে হাজির হবে ওদের শেষবারের মত দুর্গাঠাকুর দেখা।মৃত্যুর অত কাছাকাছি বছরের পর বছর ধরে থাকার জন্যে মানুষগুলো বুঝতেই পারেনি, ট্রেন ছুটে আসছে।

আমি জানিনা এটা কার দোষ, ট্রেন ড্রাইভারের? প্রশাসনের? পুজা কমিটির?

প্রথমবার যখন ডিএমইউ ট্রেন চালু হয়, আমি বেশ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, সেই অল্প স্বল্প গতিতে চলা ট্রেনের জায়গা যেন এক দানব দখল করে নিল। মনে হচ্ছিল নতুন ট্রেনগুলোর আকার, গতি কেমন যেন বেমানান ওই অঞ্চলের নরমসরম মানুষগুলোর পক্ষে। ভাবলাম, প্রগতি হচ্ছে। এখন বুঝেছি, ওই চারজন মানুষ হল, ওই প্রগতিরই বলি।আজ সকালে দেখলাম সব ট্রেনগুলো ধীরে ধীরে যাচ্ছে, বার বার হুইসিল বাজিয়ে। কি লাভ? এতো থাকবে না বেশীদিন। হয়ত মরবে আরো মানুষ।

কামদুনির ক্ষোভ — মৃতার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে দিচ্ছে না পুলিশ

৭ জুন বারাসাত ২নং ব্লকের কীর্তিপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কামদুনি গ্রামের ২০ বছর বয়সি কলেজ-ছাত্রী শিপ্রা ঘোষকে দিনেরবেলায় ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। এরকম ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু যেটা সকল সাধারণ মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়, তা হল, এই ঘটনার পরে শিপ্রার পরিবার সরকারি অর্থ ও চাকরিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সরকারের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে। তাঁদের এই দৃঢ় মনোভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে জনআন্দোলন এবং ‘কামদুনি প্রতিবাদী মঞ্চ’। গত চারমাস ধরে এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য সরকার ও শাসকদল সর্বোতভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছে। ইদানীং দুর্গাপুজোর ঠিক আগে মিডিয়া মারফত সকলে জানতে পারে যে ওই পরিবার সরকারি অর্থ ও চাকরি গ্রহণ করেছে এবং গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। এই ঘটনার পর আমরা পত্রিকার পক্ষ থেকে ‘কামদুনি প্রতিবাদী মঞ্চ’-এর সভাপতি ভাস্কর মণ্ডলের সঙ্গে ১২ অক্টোবর কথা বলি। তাঁর বক্তব্যের কিছুটা অংশ প্রকাশ করা হল। •

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার নাম করে সোজা মহাকরণে

ওরা প্রথমে শুরু করেছিল, আমরা চাকরি বা টাকা নেব না, যার জন্য এত বড়ো আন্দোলন হল। আমরাও তাতে নেমেছিলাম। একটা দরিদ্র পরিবার, কিন্তু তাদের একটা আত্মসম্মান আছে। পরবর্তী সময়ে তাদের ভুল বুঝিয়ে চাকরি ও টাকা নেওয়ানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সুবিচার অবশ্যই হবে। সেই আশায় হয়তো ওরা চাকরি নিয়েছে। কিন্তু ওরা যে চাকরি এবং টাকা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেটাই আমাদের গর্বিত করেছিল এবং আমরা আন্দোলনটা শুরু করেছিলাম। আমার মনে হয় যে কোনো প্রকারে ওদের ভুল বুঝিয়ে ওগুলো নেওয়ানো হয়েছে যাতে আন্দোলনটাকে আর বড়ো না করা যায়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ওদের সোজা মহাকরণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেদিন আমি বাড়িতে ছিলাম না, ব্যক্তিগত কাজে বাইরে গিয়েছিলাম। ওনার বাবা-মায়ের শরীরটা খারাপ হয়েছিল। বাইরে থেকে গাড়ি এসেছিল। ওরা গেল, প্রথমে ওদের আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে ওদের ফোনের সুইচ অফ রয়েছে। পুলিশ আমাদের ওদের বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। ওরা যখন চাকরি আর টাকা নিয়ে ব্যাক করল, আমাদের প্রতিবাদী মঞ্চের ৪৬ জন আমরা মিটিংয়ে বসেছিলাম। বসার পর ওদের ফ্যামিলিকে ডাকতে গিয়েছিলাম। পুলিশ আমাদের ঢুকতে দেয়নি। পুলিশ বলল, যদি ওদের সঙ্গে কথা বলতে হয় ফোনে কথা বলো। আমরা বললাম, আপনাদের পারমিশন নিয়ে ঢুকছি। ওরা বলল, কোনো পারমিশনই নেই তো আপনারা ঢুকবেন কী করে? যখন ফোন করলাম, ফোনের সুইচ অফ বা রিঙ হয়ে যাচ্ছে, কল রিসিভ হচ্ছে না। তারপর থেকে ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। ওরা রাস্তায় বেরোচ্ছে না। বাড়ির থেকে গাড়ি করে ওরা চলে গেছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না। তা সত্ত্বেও দোষ দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের প্রতিবাদী মঞ্চ ওদের হুমকি দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

চাকরি ও টাকা নেওয়ার ব্যাপারে গ্রামবাসী ওদের ওপর ক্ষুব্ধ এই কারণে যে ওরা এতদিনই তো নিতে পারত। গ্রামকে এত দূর নিয়ে গিয়ে এখন পিছিয়ে পড়াটা ওরা মনে হয় ঠিক করেনি। ওদের প্রতিবেশীরা ওদের সঙ্গে কথা বলছে না। শান্তিরক্ষা কমিটির ব্লাড ডোনেশন প্রোগ্রামের সম্ভবত দু-দিন আগে এবিপি-র প্রোগ্রামে ওর ভাই এসেছিল, সেখানে ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল। ও বলে, ‘আমাদের কেউ বাড়িছাড়া করেনি। আমরা স্ব-ইচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে এসেছি। আমরা আগামীকাল বাড়িতে যাব।’ পরবর্তী সময়ে ও বাড়িতে এসেছিল, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে ছিল। সেইদিনই ওরা আবার বাড়ি থেকে চলে যায়। ৭ জুন ঘটনাটা ঘটেছিল, প্রতিমাসের ৭ তারিখ আমরা গ্রামে একটা স্মরণসভা করি। এরপর ৭ অক্টোবরের স্মরণসভার জন্য ওদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি, কিন্তু পাইনি। আগামীতেও আমরা স্মরণসভাটা চালাব। ওদের ডাকব। এবারের স্মরণসভায় বৃষ্টির মধ্যে গ্রামবাসী এসেছে, বাইরের প্রতিবাদীরাও এসেছে। প্রায় এক হাজার লোক হয়েছিল।

কামদুনি শান্তি রক্ষা কমিটিতে বাইরের লোকই বেশি

আমাদের প্রতিবাদী মঞ্চ নারী নির্যাতন বিরোধী। আমরা পশ্চিমবাংলার যেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে, পাশে গিয়ে দাঁড়াব। আমরা চাই তারা সুবিচার পাক। পরবর্তীকালে চাকরি, টাকা এগুলো তো তাদের পাওনা। ... প্রথম থেকে সমস্ত গ্রামবাসীরা মিলে আন্দোলনটা শুরু করেছিলাম। কামদুনিতে চারটে পাড়া আছে। সমস্ত গ্রামবাসীকে ডেকেছিলাম। সকলে মিলে ঠিক করেছিল, কারা কোন পদে থাকবে। আমি সভাপতি, মৌসুমি কয়াল সম্পাদক। আমরা কোনো চাঁদা তুলিনি। যার যেরকম সামর্থ নিজের নিজের পকেটের পয়সা খরচ করেই সব কাজ করেছি। পরে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এসে শান্তি রক্ষা কমিটি গঠন করলেন (গত মাসে), আমাদের বিরুদ্ধে রটনা হচ্ছে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি। আমাদের আন্দোলন তো সরকার বিরোধী না। আমাদের উদ্দেশ্য হল নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং তাদের সুবিচার পাইয়ে দেওয়া। আমরা নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা বাজার থেকে তুলেছি, নিজেদের আখের গোছাচ্ছি, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা নন-পলিটিকাল, কোনো পার্টির সঙ্গে আমরা যুক্ত না। সমস্ত পার্টির লোক আমাদের সঙ্গে আসতে পারে, কোনো ব্যানার নিয়ে নয়। বর্তমানে যাঁরা সরকারে আছেন, ওনারাও আসতে পারেন। ওনারা যদি কোনোভাবে আগ্রহী হন, আমাদের ডাকেন, অবশ্যই আমরা যাব।

এরপর দুয়ের পাতায়

সম্পাদকের কথা

মোটরগাড়ি কমাও!

সাইকেল-নিষেধাজ্ঞা পাঁচ বছর পার হয়ে যাওয়ার পর বড়ো মিডিয়া আবিষ্কার করেছে, কলকাতায় সাইকেল চালানো নিষেধ হয়ে রয়েছে। হু-র একটি রিপোর্টের জেরে তারা এটাও আবিষ্কার করেছে, কলকাতার বাতাস ধোঁয়ার দূষণে ভারাক্রান্ত। যার ফল ফুসফুসের রোগ থেকে ক্যানসার। হ্যাঁ, গাড়ি বেশি চললে ধোঁয়া বেশি বেরোবে, তা আমরা দেখতে পাই বা না পাই। তা থেকে রোগ অনিবার্য। আর প্রাইভেট কার বেশি চড়লে পায়ে-হাতে-কোমরের রোগ থেকে হার্টের অসুখ, সুগার — সবই হতে পারে। বহুদিন থেকেই কলকাতার বেশ কিছু জায়গায় সন্ধ্যেবেলার বাতাস নাকে টানার অনুপযোগী হয়ে ওঠে। নাক থাকলেই তা বোঝা যায়। রাস্তার গড় গতিও কমে গিয়েছে। যে কোনো ট্যাফিক সিগনালে আটকালেই চোখে পড়ে অগুনতি প্রাইভেট গাড়ি আর ট্যাক্সির সারি, হয়তো হাতে গোনা কয়েকটি বাস। কলকাতায় প্রাইভেট গাড়ির বিস্ফোরণ ঘটেছে গত কয়েক বছরে।

প্রতিবাদ ও লেখালেখি হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা পুলিশ এখনও রাস্তা থেকে সাইকেল, রিক্সা লরিতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ২৯ অক্টোবর সকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনে থেকে পুলিশ লরিতে তুলেছে দুটি রিক্সা। কলকাতার রাস্তায় ক্রসিংয়ে পথচারীদের জন্য বরাদ্দ থাকছে ২ সেকেন্ড, ৫ সেকেন্ডের জন্য সবুজ বাতি — এবং তখনও অন্যদিকের গাড়ির যাতায়াত শেষ হচ্ছে না। বড়ো রাস্তা ছাপিয়ে প্রাইভেট গাড়ির হামলা শুরু হয়েছে শহরের গলিরাস্তায়। যেসব বাড়িতে পার্কিং লট নেই, তাদের বাড়ির গাড়িগুলো পার্ক করা হচ্ছে রাস্তায়। বড়ো রাস্তার জ্যাম এড়াতে গলিরাস্তা দখল করে নিয়েছে প্রাইভেট কার। অফিস টাইমে গলি রাস্তা দিয়েও হাঁটা যায় না এদের দাপটে।

মিনমিন না করে, কথা না ঘুরিয়ে, সরাসরি জোর গলায় বলার সময় এসেছে, কলকাতায় মোটরগাড়ি কমাও!

প্র থ ম পা তা র প র

কামদুনির ক্ষোভ

শান্তি রক্ষা কমিটি আমাদের সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। আমাদের নামে কেচ্ছা রটিয়েছে, আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছি, দিল্লি গিয়ে টাকা নিয়ে এসেছি। ওদের পরিবারকে দেখিয়ে বাজার থেকে অনেক টাকা রোজগার করছি। এগুলো আমাদের ছোটো করা এবং প্রতিবাদী মঞ্চকে থামিয়ে দেওয়া। ... আমি শুনেছি যে কমিটিতে আমাদের গ্রামের একজন প্রাক্তন মাস্টারমশাই আছেন, ওনার নাম শেখ সিরাজুদ্দিন আহমেদ। ঘটনাটা ঘটার পর শান্তি রক্ষা কমিটি গঠন হওয়া পর্যন্ত উনি আদৌ গ্রামে আসেননি বা ওদের পাশে দাঁড়াননি। হঠাৎ করে যখন কমিটি গঠন করা হল, তখন ওনাকে প্রেসিডেন্ট করা হল। কমিটিতে গ্রামের বাইরের লোকই বেশি, গ্রামের লোক কয়েকজন আছে। আমি যতদূর শুনেছি, ওই কমিটিতে ১২ বা ১৫ জন সদস্য আছে।

অনেক ছেলে আন্দোলনের জন্য কাজ ছেড়ে দিয়েছিল

এখন শাসন পুলিশ ফাঁড়িটা থানা হয়েছে। গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প আছে, মোড়ে মোড়ে পুলিশ আছে। আর আমার ওপর প্রেশার তো আছেই। আমার বাড়িতে পুলিশ গিয়েছিল, সার্চ করেছিল, আমাকে খুঁজছিল। আমি কোনো রাজনীতি করি না। আইনত কারও বাড়িতে সার্চ করতে গেলে একটা অর্ডার লাগে। সকাল সাড়ে এগারোটা পৌনে বারোটা নাগাদ কোনো অর্ডার ছাড়াই ওরা আমার বাড়িতে ঢুকে সার্চ করেছে। আমি পুলিশকে পরে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম।

আগে আমি রাজারহাটে ডিএলএফ-এ কাজ করতাম। এখন কোথাও করছি না। ঘটনা ঘটার দিন থেকে আমি চাকরি থেকে রিজাইন দিয়ে দিই। আমি তিনমাস কাজ ছেড়ে আছি। আর্থিক দিক দিয়ে তো ক্ষতি হয়েছেই। বাবা মাছের বিজনেস করেন। বাড়িতে মা, বাবা আর ভাই আছে, বোন দুটো ছিল, বিয়ে হয়ে গেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ঘটনায় নাড়া খেয়েছিলাম। এখন আমাকে কাজে ফিরতে হবে। দেখি কী পাওয়া যায়। অনেক ছেলে সেইসময় কাজ ছেড়ে দিয়েছিল আন্দোলনের জন্য। কেউ কেউ কাজে ফিরে গেছে। এখনও তিন-চারজন আছে।

আমাদের মন যে শক্ত ছিল তা ওনাদের জন্যই। কিন্তু ওদের ফ্যামিলিটা যখন চলে গেছে, একটু দুর্বলতা তো আসবেই। তবে আগে গ্রামে মেয়েদের ওপর যেসব ঘটনা হত, অনেকটা কমে গেছে।

এবার আলুর দামও বাড়ল কেন?

২৫ অক্টোবর, মুহাম্মাদ হেলালউদ্দিন ও জিতেন নন্দী, কলকাতা •

কলিম খানের দোকানে আজ খুচরো আলুর দর ১৮ টাকা/কেজি। এই মুদির দোকানে শুধু জ্যোতি আলুটাই পাওয়া যায়। সামনের জয়দেব পালের দোকানেও তাই। জানবাজারের ফুটপাতে চন্দ্রমুখী আলুও বিক্রি হচ্ছে, ২০ টাকা/কেজি। একটা খারাপ জ্যোতি আলুও পাওয়া যাচ্ছে ১৬ টাকায়।

গত ক-দিন কেজিতে রোজ ২ টাকা করে আলুর দাম বেড়েছে। এঁদের দিনে এক থেকে দুই বস্তা আলু বিক্রি হয়। কিন্তু এখন বিক্রি কমছে। অন্য সবজির দর আরও চড়া। তাই এ তল্লাটের হোটেলওয়ালারা রান্নায় আলুটা বেশি খরচ করছিল। তরকারিতে অন্য সবজি কম দিয়ে আলুটা বেশি করে দিয়ে ম্যানেজ করা যাচ্ছিল। কিন্তু এখন তাদেরও চিন্তা — আলুও তো চড়তে শুরু করেছে!

আপনারা কেন দাম বাড়ালেন? কলিম খান আর জয়দেব পাল একবাক্যে বললেন, 'বা! রোজ পঞ্চাশ কেজির বস্তায় পঞ্চাশ টাকা করে দাম বাড়ছে। তাও আলুপট্টিতে আলু পাওয়া যাচ্ছে না। বলছে, আলু উড়িষ্যায় চলে গেছে। পুজো গেল, বকর-ঈদ গেল, তার আগে আলুর দর ছিল ১০-১২ টাকা। বস্তা ছিল ৩৫০ টাকা। আর আজ ৭৫০ টাকায় আলু কিনেছি।'

আমরা গেলাম পাশেই আলুপট্টিতে। পরপর ১৬ খানা গোডাউন। শম্ভু গুপ্তা বললেন, 'দাম বাড়ুক আর কমুক তাতে আমাদের লাভও নেই, লোকসানও নেই। আমরা কমিশনে কাজ করি। বস্তায় ৯ টাকা কমিশন। এখানে ডেলি ২০০০ থেকে ২৫০০ বস্তা আলু আসে। এই সপ্তাহে এসেছে ১৫০০ বস্তা। স্টোর থেকে আলু ছাড়ছে না।'

স্টোরে কি আলু যথেষ্ট নেই? যার কাছেই গেছি, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে, এ রাজ্যের জন্য আলুর কোনো ঘাটতি নেই। এখন ব্যাঙ্গালোরের একটা নতুন আলু এসেছে, নামমাত্র পরিমাণে। ডিসেম্বরে আসবে পাঞ্জাবের নতুন আলু। জানুয়ারিতে বাংলার নতুন (কাঁচা) আলু উঠবে। তার আগে ১৫ ডিসেম্বর স্টোর বন্ধ হয়ে যাবে। মাঝের দুমাসের আলু স্টোরে মজুত আছে।

তাহলে জানবাজার বা কলকাতা শহরে আলুর জোগানে টান পড়ল কেন? কেনই বা দাম বাড়ল?

জানবাজার আলুপট্টি থেকে আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম হুগলির মণিপুরে। মনোজ কুমার পাল বললেন, 'আমরা হলাম ফড়ে। ট্রেডিংয়ের ব্যবসা করি, কমিশনে কাজ। আলু সব চলে যাচ্ছে আসাম, বিহারে। আজ মাত্র ৭০ খানা আলু পেয়েছি। কী করব বলুন? এখন দিদি যদি বর্ডার সিল করে দেন, তবে আমরা আলুটা পাব।'

আর এক বড়ো ব্যবসায়ী বলরাম পোরেল বললেন, 'গড় আলুটা চলে যাচ্ছে বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রে। ওদের আলু নেই। ইউপি-তে তো আর ৫-৭ দিনের আলু আছে। তারপর?' বুঝলাম, অন্য রাজ্যের তুলনায় এখানে আলুর স্টকটা ভালো। তাই অন্য রাজ্যে এখানকার আলুর চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বেশি দামে আলু কিনতে হবে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা বাঁকাভঙ্গিতে বলরাম পোরেল বললেন, দেখুন এখানে তো আলুচাষি আর ব্যবসায়ীরা বিশাল লস খাচ্ছে। তার ওপর দিদি যদি বাইরে আলু যাওয়া পুরো বন্ধ করে দেন, তাহলে তো আমরা দাম পাব না। হ্যাঁ, একটু-আধটু নিয়ন্ত্রণ করুন। কিন্তু বেশি বেশি করলে দামটা তো বাড়বে না।' অর্থাৎ আলুর বড়ো ব্যবসায়ীরা যে কোনো উপায়ে দাম বাড়াতে চাইছে। সরকার আর মিডিয়া প্রথমে চুপ করে দেখছিল। এখন 'ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা'র ভঙ্গি করছে!

'গড়' আলুটা কী? যতদূর জানা গেল, বাইরের রাজ্যের জন্য যে আলুটা বস্তা বোঝাই হয়, সেখানে কোনো পচা-কাটা বাছাই করা হয় না। অথচ সেখানে দামটা ভালো পাওয়া যায়। তাই শেষের এই দু-মাসে চড়া দরে ওই গড় আলু বিক্রি করে স্টোর খালি করতে পারলে স্টোরে যারা আলু রেখেছে তাদের লাভ।

বৃষ্টির জন্য আলু লাগাতে দেরি হচ্ছে

মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানায় পুজোর সময় আলু ছিল ৮ টাকা/কেজি। এখন ১৫ টাকা। আমাদের পাশের বড়ঞা থানা ময়ূরাক্ষীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় আলুর ফলন ভালো হয়। ওখানকার ডাকবাংলার মোড়ে তিনটে কোল্ড স্টোরেজ আছে। এখন দর যাচ্ছে ৫৫০ টাকা বস্তা, খোলাবাজারে খুচরো দর ১৪ টাকা। গতকাল বহরমপুর দিয়ে আসার সময় দেখেছি দর ছিল ১৮ টাকা।

মুর্শিদাবাদের বড়ঞা, দামোদর নদের তীরে বাইনান, আক্রা, খাজুটি, তাজপুর, আমতা, মোষরাঙা — এইসব এলাকাগুলো এখনও জলে ডুবে আছে, জল সরেনি। একই অবস্থা হুগলির উদয়নারায়ণপুরেও। ফলে আলু লাগাতে প্রায় একমাস দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে জানাচ্ছে এখানকার চাষিরা। এর দরুন জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বাংলায় যে নতুন আলু ওঠার কথা, তা উঠতে যথেষ্ট দেরি হয়ে যাবে।

মৃত্যু উপত্যকা কেদারনাথের পথে (পর্ব এক)

সাজিশ জি পি, কেরালা, ২৭ অক্টোবর। লেখক জুন ২০১৩ বিপর্যয়ের আগে ৬ বার গেছেন কেদারনাথ, ট্রেকার পর্যটক হিসেবে। বিপর্যয়ের পর ১৩ অক্টোবর তিনি ফের যান কেদারনাথ। ফিরে এসে ২৭ অক্টোবর তাঁর ব্লগে (http://indiegenous.blogspot.in/2013/10/a-picturesque-uttarakhand-state.html) *ইংরেজিতে লেখেন এইবারের যাত্রার সচিত্র বর্ণনা, 'ব্যাক টু কেদারনাথ, এ ভ্যালি অব ডেথ'। এখানে তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে, লেখকের অনুমতিক্রমে। অনুবাদক শমীক সরকার।* •

৫ অক্টোবর থেকে উত্তরাখণ্ড সরকার দৈনিক সর্বাধিক ২০০ জন মানুষকে কেদারনাথ যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। আমি ট্রেকার তিলক-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলাম, কেদারনাথ যাওয়া যায় কি না তার জন্য। এই সুযোগে রওনা দিলাম। ১৩ অক্টোবর আমরা গুপ্তকাশী পৌঁছালাম, সেখানে পারমিট নেওয়া এবং স্বাস্থ্য চেকআপের বন্দোবস্ত ছিল। আমরা মোট ৭ জন ছিলাম, তার মধ্যে একজন ছিল ১৭ জুনের ধ্বংসকাণ্ডে কেদার থেকে বেঁচে ফেরা, নাম সুশান্ত।

গুপ্তকাশী পর্যন্ত আসার পথটিও ভালো ছিল না, বিপর্যয়ের চিহ্ন ছড়িয়ে ছিল সেখানকার সর্বত্র। যাই হোক, গুপ্তকাশী থেকে সকালে রওনা দিয়ে এগারোটার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম রামপুর, গৌরীকুণ্ড (আগে যেখান থেকে কেদারনাথ যাওয়ার জন্য ১৪ কিমি হাঁটা শুরু হত) থেকে কিছুটা আগের একটি মিনি শহর। রামপুরে নজরে পড়ল পরিত্যক্ত দোকানপাট, সেলুন। একটু উঁচুতে সীতাপুরে পার্কিং লটে পড়ে রয়েছে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গাড়ির কঙ্কাল। কেদারনাথের জন্য পায়ে হাঁটা পথ এখন শুরু হচ্ছে শোনপ্রয়াগ থেকে, যা গৌরীকুণ্ডর সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার আগে। তাই মোট হেঁটে যেতে হবে ২০ কিলোমিটারের কিছু বেশি।

শোনপ্রয়াগে পড়ে রয়েছে ভাঙাচোরা গাড়িগুলো, গায়ে 'লাপতা' লাগানো পোস্টার। এখান দিয়ে যেতে যেতে আমার নাকে বিশ্রী গন্ধ লাগছিল। ভাবলাম আমার মনের ভুল, তাই গাইড তিলক আর বিজেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলাম। ওরাও বলল, গন্ধ পাচ্ছে। অর্থাৎ এখানেও ধ্বংসস্তূপের নিচে কিছু মরা মানুষ বা পশু রয়ে গেছে এখনও, ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে সেগুলোকে যথাযথভাবে সমাধিস্থ করা হয়নি। এই গন্ধ গোটা যাত্রাপথেই আমার নাকে লেগে ছিল।

শোনপ্রয়াগ হল দুটি নদীর সঙ্গমস্থল — বাঁদিকে রয়েছে শোনগঙ্গা, আর ডানদিকে মন্দাকিনি। সেখানে একটা বিশাল লোহার ব্রিজ ছিল। এখন তার চিহ্নমাত্রও নেই। আমরা শোনপ্রয়াগ থেকে ট্রেক শুরু করলাম দুপুর ১২টায়। আগে গাড়ি চলার রাস্তা ছিল গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত। এখন রাস্তাটার বেশিরভাগটাই আর নেই। শোনপ্রয়াগ থেকে আমরা পায়ে হেঁটে এলাম গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত সেই রাস্তা ধরে, যেটা দিয়ে আগে খচ্চরদের নিয়ে যাওয়া হত গৌরীকুণ্ড। বিপর্যয়ের আগে সিজনে দিনে পাঁচ থেকে দশ হাজার খচ্চর জড়ো হতো গৌরীকুণ্ডে। গাড়ি যাওয়ার রাস্তার থেকে আলাদা একটি রাস্তা তৈরি করতে হয়েছিল এত খচ্চর নিয়ে যাওয়ার জন্য। যারা হাঁটতে পারে না বা চায় না, তাদের এই খচ্চরে করে কেদারনাথ অবধি পরিবহণের ব্যবস্থা ছিল। খাড়া উঠে যাওয়ার কারণে এই রাস্তাটা ট্রেকারদের পক্ষেও সহজ নয়। গৌরীকুণ্ডের দিকের গাড়ি রাস্তা, যার বেশিরভাগটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেটাতে দূর থেকে দেখলাম, কিছু পরিত্যক্ত বাস ও প্রাইভেট গাড়ি। ভাঙাচোরা, এবরো খেবরো। এদের হৃদয় থাকলে এরা বলে উঠত, কিছুই তো হয়নি আমাদের। কারণ হাজার হাজার গাড়ি এই রাস্তা থেকে ভেসে গেছে। *ক্রমশ*

সংবাদ সংলাপ

নকশাল রাজনীতি না করেও পুলিশের অত্যাচারের শিকার হন শচীন সেন

সংবাদমন্থনের ১ অক্টোবরের পঞ্চম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা প্রকাশের পরক্ষণেই হালতুর শ্রীমান চক্রবর্তী ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন : সংবাদমন্থনের হল কী? প্রথম পাতার খবরে 'খোলা রাস্তার ওপর জুয়ার আসর'?

'রাষ্ট্রনির্ভর অধিকার থেকে বেরিয়ে অন্য একটা ধারণা ...' এ খবর প্রসঙ্গে যাদবপুরের সোহিনী জানিয়েছে, সে শচীন সেন স্মারক বক্তৃতায় ছিল। সেখানে সভার শেষে শচীন সেনের মেয়ে ছোট্ট একটি মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে জানা যায়, তাঁর বাবা শচীন সেন নকশাল রাজনীতির সাথে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। তাঁর সন্তানেরা এই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল, ফলে তাঁর বাড়িতে নকশালদের আনাগোনা ছিল। তিনি আর পাঁচজন পিতার মতোই একজন স্নেহবৎসল পিতা ছিলেন। অথচ পুলিশ তাঁকে নির্মম অত্যাচার করে। উনি কোনো রাজনৈতিক আদর্শ বা বোধের কারণে এই অত্যাচার ভোগ করেননি, পুলিশি সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিলেন। শতবর্ষে তাঁকে যতটা না শহিদ, তার চেয়ে বেশি যথার্থ পিতা ও দায়িত্ববান সামাজিক মানুষ বলেই মনে হয়েছে।

চতুর্থ পাতায় 'আমার ও স্ত্রী ও আমি আশাবাদী, আমার ওপর যা হয়েছে ...' খবরে আমেরিকাবাসী মানুষটি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন, তা পড়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার ভাতশালার মহীদুল মণ্ডল জানিয়েছেন, এও কি সম্ভব? আর চণ্ডীগড়ের জ্ঞানদীপ সিং ছোট্ট মন্তব্য করেছেন, 'ভালো খবর, ভালো মানুষ'।

সংবাদমন্থনে প্রকাশিত যে কোনো কিছু সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানান নিচের ঠিকানায় :
বঙ্কিম
কল্যাণগড়, অশোকনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা।
ফোন : 03216-238742,
ইমেল: manthansamayiki@gmail.com

চলতে চলতে

কাজ দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে নাকি?

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ৮ অক্টোবর •

ডেকার্স লেনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ফোন করার একটা দোকান খুঁজতে খুঁজতে। চিত্তদার দোকানসহ অফিসপাড়াখ্যাত সব জলখাবারের দোকান পেরিয়ে, বাঁহাতে দুটো বার-কাম-রেস্তোরাঁ পেরিয়ে বাঁদিকে সরুগলি গিয়ে বড়ো রাস্তায় উঠেছে। তারই মুখে পাওয়া গেল ফোনের দোকানটি। বেশ বড়ো দোকানে ফাঁকা টেবিলে একটা ফোন। দোকানদার তখন জলন্যাকড়া দিয়ে টেবিল ও ফোন পরিষ্কার করছে। সম্ভবত আমিই প্রথম খদ্দের। পেলাম না, ওপারে ফোন এনগেজড। পরপর দুবার করে পেলাম না। ভীষণ বাথরুম পেয়ে গেছে। উল্টোদিকে খাবার দোকানে যে আটা মাখছিল, তাকে জিজ্ঞেস করায়, ওপাশে সরুগলি দেখিয়ে দিল। গলিটায় ঢুকে দেখি একটা ঘেয়ো কুকুর বসে ঝিমোচ্ছে। তারপরে সারি সারি প্লাস্টিকের জার শোয়ানো, তার পাশে বসে হাতে ছোটো আয়না নিয়ে একজন দাড়ি কামাচ্ছেন, তাঁকে প্রশ্ন করায় তিনি ইশারায় আরও ভিতরে যেতে বললেন যেখানে ডেকচিতে রাশি রাশি মুরগির মাংস ধুচ্ছে একজন, তাকে টপকে ডানদিকে অন্ধকার ঘুপচিতে বাথরুম করতে গিয়ে শুনি ঘটাং ঘটাং আওয়াজ। ওটা একটা প্রেসের পিছনদিকে – সেখান থেকে কাগজ ছাপার শব্দ আসছে। পেচ্ছাপের ঝাঁঝালো গন্ধে দমবন্ধ করে কাজ সেরে প্রায় পালিয়ে এলাম।

এসে আবার ফোন। নেই — সেই এনগেজড টোন, কার সঙ্গে যে জিতেন এতক্ষণ কথা বলছে! আমার জরুরি ফোন। করতেই হবে উলটো দিকের চায়ের দোকান থেকে দু-টাকা দিয়ে হাফ-কাপ চা খেলাম। খেয়ে ফোন করলাম। তখনও কথা বলছে। তারপর সিগারেটের অর্ধেকটা বার করে ধরিয়ে ফেললাম। সামনের মিষ্টির দোকানে জোর গণ্ডগোল। একজন কর্মচারী বসে বসে কয়লা ভাঙছে আর দোকানের মালিক তাকে গাল দিচ্ছে – 'আমি ছিলাম না বলে যা খুশি করেছিস। ওর ঘাড় ভেঙে মাছ খাসনি।' কর্মচারী কয়লা ভাঙতে ভাঙতেই বলে – 'ও এসে বলুক, আমার সামনে বলুক।' 'বলবেই তো। তোরা দোকানে মাছ এনে খাসনি? কাটাপোনা খাচ্ছে। কোন বাড়ির লোক কাটাপোনা খায় হ্যাঁ?' পাশের উনুনে কচুরি ভাজছিল আরেকজন কর্মচারী। সে থামাতে চেষ্টা করায় গণ্ডগোল আরও বেড়ে গেল। পাশের দোকানের একজন বলল – 'খেয়েছে তো কী হয়েছে?' ব্যস, আগুনে ঘি, দোকানদার খেপে গিয়ে বলল 'ওসব আমার এখানে চলবে না।' কর্মচারী হাতুড়ি দিয়ে কয়লার স্তূপে প্রচণ্ড এক বাড়ি দিয়ে বলল — 'থাকবও না, চলে যাব, কাজ দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? আমাকে যেন রোজ মাংস খাওয়াচ্ছে?'

এইবারের চেষ্টায় জিতেনকে পেলাম। দুমিনিট মাত্র কথা বলেছি। তারপর ফিরে দেখি কর্মচারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, 'চলে যাব, দু হপ্তার মাইনে দিয়ে দাও।' বলে সে কিন্তু কয়লাভাঙা থামায়নি। দোকানদার দোকানঘর ছেড়ে বাইরের দিকটায় এসে খুঁটিতে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। ওখান থেকে একটু এগোলেই গলির মোড়ের ওইপারে রাজভবনের মাথায় সাদাপাথরের সিংহটার মতোই দোকানদারের মুখ একটু খোলা – দুটো দাঁত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আপাতত আক্রমণ প্রত্যাহত।

আক্রমণ দেখলাম আবার খানিক এগিয়ে। টেলিফোনভবন পেরিয়ে যেই ওপারের ফুটে উঠেছি দেখি এক অফিসবাবু একহাতে অফিসের ব্যাগ অন্যহাতে বুকের কাছে একটা গামছা গোছ করে ধরা – একটা ১৫/১৬ বছরের হাফপ্যান্ট-শার্টপরা ছেলেকে ধমকাচ্ছেন। আরেকজন পথচারী জিজ্ঞেস করায় বললেন — 'এমনভাবে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এমন ধাক্কা মেরেছে আমার বুকে, আমার শরীর খারাপ করছে। দেখি ছেলেটা মাথা নিচু করে একটা খালি পা আরেকটা খালি পায়ে ঘষছে। অফিসবাবু অমনি রুখে উঠে 'দারু পিয়া, দারু নেহি পিয়া' বলে ছেলেটার হাঁ – না দুরকম ঘাড় নাড়া দেখে, বাঁ হাতে দুই চড়। আমি বলেই ফেললাম – 'কী হচ্ছে দাদা, ছাড়ুন।' লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার হাতে গামছা দিয়ে দিল। ছেলেটার কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। গামছাটা নিয়ে মাথায় বাঁধতে বাঁধতে দৌড় লাগাল। দূরে ওর এক সঙ্গী। দুজনের চেহারা দেখে মুটেমজুর মনে হয়। দু-জনে এমন সহজভাবে চলে গেল! ওদের সম্মান আমাদের মধ্যবিত্তদের মতো সহজে ভাঙে না। অফিসবাবুর আক্রমণ ব্যর্থ।

তথ্য নথি ছবি ছাপ খুচরোর দোহাই পেড়ে পরিষেবা গোটাচ্ছে সরকার

রেলমন্ত্রকের ইজ্জত মান্থলির নিয়মাবলী পরিবর্তনে মানুষের মাথায় হাত

শমিত, শান্তিপুর, ২৫ অক্টোবর •

বিগত তিন-চার বছর ইজ্জত কার্ডের সুবাদে যাদের মাসিক উপার্জন ১৫০০ টাকার মধ্যে তাদের ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত রেল যাত্রার সুবিধে হচ্ছিল। দেশের অসংখ্য গরিব মানুষ এর দ্বারা খানিকটা আর্থিক সুবিধে পাচ্ছিল। সম্প্রতি রেল দপ্তর ইজ্জত মান্থলি প্রকল্পে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করায় স্বল্প উপার্জনের রেল যাত্রীরা বেশ অসুবিধায় পড়েছে।

সাধারণত ছোটোখাটো নির্মাণ শ্রমিক, ঠিকে কাজের লোক, রিপুর কারিগর সহ অসংগঠিত অসংখ্য কাজের লোক খুবই অসুবিধায় পড়তে চলেছে। নতুন নিয়মাবলীতে রেলদপ্তর জানিয়েছে, অনেক কিছু লাগবে ইজ্জত মান্থলি পেতে গেলে। প্রথমত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এসডিও, বিডিও-র সার্টিফিকেট, সাংসদ সার্টিফিকেট, যিনি মান্থলি ব্যবহার করছে তাঁর সম্পূর্ণ পেশার বিবরণ ও কর্মস্থলের সম্পূর্ণ ঠিকানা এবং বিপিএল তালিকাভুক্ত হলে তার ফটোকপি। এতগুলো তথ্য, নথি সব ঠিকঠাক থাকলে তবেই একজন ইজ্জত মান্থলি কার্ডের সুবিধা পাবে। এতদিন শুধুমাত্র পৌরপ্রধান বা পঞ্চায়েত প্রধানের ইনকাম সার্টিফিকেট এবং সাংসদ বা বিধায়কের শংসাপত্রের ভিত্তিতে একজন যাত্রী 'মান্থলি' ২৫ টাকার বিনিময়ে কাটতে পারত। নতুন নিয়মাবলীর জটিলতায় অক্টোবর থেকে আর সেই সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। রেলমন্ত্রকের নতুন সিদ্ধান্তে অনেক অসংগঠিত পেশায় যুক্ত মানুষ বিপাকে পড়েছে। দৈনিক ১০০-১৫০টাকা উপার্জনকারী খেটে খাওয়া মানুষ ওই সমস্ত সার্টিফিকেট জোগাড় করতে নাজেহাল হচ্ছেন বলে জানা গেছে।

শান্তিপুর অঞ্চলে জামা কাপড়ের দোকানে প্রতিদিন কাজে যেত অনেক কারিগর, ওই ইজ্জত মান্থলির কল্যাণে। কিন্তু নতুন এই বিধি ব্যবস্থায় তাদের কাজে যাওয়া বন্ধ হতে বসেছে। বিডিও অফিস এসডিও অফিস ঘুরে ঘুরে অথবা ডিএম-এর অফিসে ধরনা দিয়েও এই সার্টিফিকেট সহজে মিলবে না বলেই মনে করছে ইজ্জত মান্থলি ব্যবহারকারীরা। কাজকর্ম শিকেয় তুলে রোজ রোজ ওই সমস্ত অফিসে যাওয়াও তাই সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন অফিসে যাওয়ার খরচই বা পাওয়া যাবে কোথা থেকে! ইজ্জত ব্যবহারকারীরা হতাশ, প্রকৃত একটা জনমুখী প্রকল্প বন্ধ করার মতলবই এঁটেছে রেলমন্ত্রক। পাশাপাশি তারা এটাও স্বীকার করেছে প্রকৃত 'ইজ্জত মান্থলি' ব্যবহারকারীরা ছাড়াও বেশি উপার্জনের অনেক মানুষও এর সুবিধা ভোগ করেছে। ভারতবর্ষে কবে আর সরকারি প্রকল্পে সব কিছুর ঠিকঠাক ব্যবহার হয়েছে!

সহজে ২৫ টাকার মান্থলির দাবিতে গত ২৮ অক্টোবর শান্তিপুর-শিয়ালদহ লাইনে বিচ্ছিন্নভাবে রেল অবরোধ করে এই মান্থলির গ্রাহকরা।

'দৈনিক টিকিট কেটে যাতায়াত করতে হচ্ছে!'

শেখ নাসিরুদ্দিন আলি

আমি রিপু করি লন্ড্রিতে। সোদপুর, বেলঘরিয়ার বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কাজ। বাড়ি আমার শান্তিপুর, বয়স তেষট্টি। আমার বিপিএল কার্ড আছে। শান্তিপুর-শিয়ালদা এখন দৈনিক ভাড়া হয়েছে চল্লিশ টাকা। আমি ইজ্জত মান্থলি-তে যাতায়াত করতাম। কিন্তু এখন ইজ্জত মান্থলির নিয়মকানুন বদলানোর পর আজ দশ বারোদিন হয়ে গেল, এখনও মান্থলি কাটতে পারিনি। প্রথমে কাউন্সিলারের কাছে গেছি। তারপর বিডিও। এখন কল্যাণীতে সাংসদের কাছে যাচ্ছি। ঘুরেই যাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই জোগাড় হচ্ছে না। ৩১ অক্টোবর।

ব্যাপক হারে মেট্রো রেলের ভাড়া বৃদ্ধি

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৭ সেপ্টেম্বর •

ফের বাড়ল রেলভাড়া। তার সঙ্গেই বাড়ল কলকাতা মেট্রো রেলের ভাড়াও। আগে মেট্রোরেলের ভাড়া ছিল ৪ টাকা, ৬ টাকা, ৮ টাকা, ১০ টাকা ও ১২ টাকা। এখন তা বেড়ে দাঁড়ালো ৫ টাকা, ১০ টাকা, ১৫ টাকা, ২০ টাকা এবং ২৫ টাকা। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে এই বর্ধিত ভাড়া কার্যকর করার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কলকাতা মেট্রো গড়িয়া অবধি সম্প্রসারণের পর থেকেই মেট্রোতে ভিড় বেড়ে গেছে, বিশেষত অফিস-কাছারি যখন চলে সেই সময়ে। মূলত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে কলকাতায় কাজ করতে আসা লোকেরা গড়িয়া নেমে মেট্রোতে করে কলকাতায় আসছে, কারণ কলকাতার রাস্তার ট্রাফিক গতি খুবই কম হয়ে গেছে, বাসও কমে গেছে ভীষণ। এককথায় সড়কপথে গণ পরিবহণের দুরবস্থার কারণে মেট্রো রেলে ভিড় বেড়েছে। এবছরই পুজোর আগে দৈনিক সাড়ে সাত লক্ষের ওপরে যাত্রী পরিবহণ করেছে কলকাতা মেট্রো, বলে সংবাদে জানা যাচ্ছে। যদিও মেট্রো রেলের দৈনিক গড় যাত্রী হয় সাড়ে ছয় লাখ এবং ছুটির দিনগুলিতে সাড়ে চার লাখ।

এই বছরের মাঝামাঝি বাজেট বহির্ভূতভাবে রেলভাড়া বৃদ্ধির সময় অজুহাত দেওয়া হয়েছিল, এক টাকা দু টাকা খুচরো যেহেতু অমিল, তাই পাঁচের গুণিতকে ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে। মেট্রোর ক্ষেত্রেও ভাড়া করা হয়েছে পাঁচের গুণিতকে। অর্থাৎ সরকারিভাবেই এক টাকা দু-টাকার আর কোনো মূল্য থাকছে না।

বালুচিস্তানের ভূকম্প পীড়িতদের জন্য ত্রাণ

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ৩১ অক্টোবর •

পুজো এবং বকর-ঈদের আগে মেটিয়াবুরুজ-মহেশতলার লিট্‌ল ম্যাগাজিন মঞ্চ মাটির কেল্লা-র পক্ষ থেকে পাকিস্তানে বালুচিস্তানের ভূমিকম্প দুর্গতদের জন্য অর্থসংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়। খবরের কাগজ সংবাদমন্থন-ও এই উদ্যোগে শামিল হয়। ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এই তহবিলে মোট ৪০০০ টাকা সংগ্রহ হয়েছে। অর্থসাহায্য করেছেন শাহির নিজামুদ্দিন, নবিবার রহমান মল্লিক, ইব্রাহিম মোল্লা, হাবিবুল্লাহ মোল্লা, মোনতাজ আলি মোল্লা, লবাব, লতিফউদ্দিন, মোরসেদ মোল্লা, আজিজুর রহমান মল্লিক, হাজী রব্বে সালাম, মহঃ সাবির হোসেন, রুহুল আমীন মোল্লা, জুম্মান আলী মোল্লা, এবাদুল্লা থান্দার, নিজামুদ্দিন হালদার, নূর হোসেন মল্লিক, আবু কালাম হালদার, শাকিল মহিনউদ্দিন, বিশ্বজিৎ রায়, সুব্রত দাস, কানাই লাল বিশ্বাস, কৃষ্ণা সেন, অমিতা নন্দী, বাপ্পা জামান, মহব্বৎ হোসেন, শর্মিষ্ঠা সিনহা, জিতেন নন্দী, শান্তনু ভট্টাচার্য, শমীক সরকার, শ্রীমান চক্রবর্তী, তমাল ভৌমিক, শমিত আচার্য। সংগৃহীত অর্থ 'শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য পাক-ভারত মঞ্চ'-এর মাধ্যমে বালুচিস্তানে পাঠানো হচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডের জন্য ত্রাণ

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ৩১ অক্টোবর •

উত্তরাখণ্ডের বন্যা ও ধসে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছিল 'মাটির কেল্লা', 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু সায়েন্স সার্কেল', 'প্রবীণ নাগরিক সংস্থা', 'নেতাজি সুভাষ রিক্রিয়েশন ক্লাব' এবং 'জগদ্ধাত্রী মিলনী সংঘ'-এর পক্ষ থেকে। ৭ জুলাই রবীন্দ্রনগরে, ২১ জুলাই সন্তোষপুরে এবং ৩১ জুলাই আকড়ায় পথে নেমে এই সংস্থাগুলির কর্মীরা অর্থসংগ্রহ করেন। আকড়া ফটক থেকে রবীন্দ্রনগর রুটের অটোচালকেরা এবং এলাকার মানুষ সাহায্য করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এগিয়ে আসেন। এছাড়া মেটিয়াবুরুজ বড়তলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরাও অর্থ দান করেন। মোট ২৪,৩০০ টাকা সংগ্রহ হয়েছে।

উল্লেখিত সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে এই সংগৃহীত অর্থ ২৮ আগস্ট ভারত সেবাশ্রম সংঘের বালিগঞ্জের দপ্তরে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত মহারাজের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁরা এই অর্থ উত্তরাখণ্ডের মানুষের যথোপযুক্ত ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজে ব্যয় করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁদের ত্রাণশিবির রয়েছে উখিমঠ, বদ্রীনাথ, গুপ্তকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ এবং হরিদ্বারে।

মোটরবাইক, জ্বালানি, দুর্ঘটনা, যানজট — হয়রান মেটিয়াবুরুজের নাগরিক জীবন

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, হাজিরতন, মেটিয়াবুরুজ, ২৭ অক্টোবর •

'জ্বালানির জন্য হয়রানি' — বড়তলা অঞ্চলে মুখে মুখে ফিরছে এই কথাটা। রান্নার জ্বালানি নয়, মোটরবাইকে জ্বালানি ভরার সমস্যা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এই নতুন বিরক্তিকর পরিস্থিতি। মেটিয়াবুরুজ বড়তলা অঞ্চলে বহু মানুষের বাস, এলাকাটি মূলত ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ব্যবসার স্বার্থে ও ছেলের বায়না মেটাতে অভিভাবকদের দাক্ষিণ্যে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দু-চাকার মোটরবাইকের সংখ্যা। বাইকের দৌরাত্ম্যে রাস্তা পার হওয়া কিংবা রাস্তার ধার দিয়ে নিরাপদে হাঁটা দিনের পর দিন মুশকিল হয়ে পড়ছে। নিয়ন্ত্রণহীন বাইক চালানো এখানকার নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

এই বাইকগুলো সারাদিন নানা কাজে এবং অকাজেও ছুটে বেড়ায়। তাই দরকার হয় প্রচুর জ্বালানির। দারুণ ভিড় হয় এলাকার একমাত্র পেট্রোলপাম্পে। বাইকের সংখ্যাবৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল মেলাতে নতুন পেট্রোলপাম্প দরকার। প্রায় প্রতিদিনই বড়তলা পেট্রোলপাম্পে ভিড় থিক থিক করে। সারি সারি বাইক যেভাবে জ্বালানি ভরতে অপেক্ষা করে, তাতে বড়ো রাস্তা প্রায়ই অচল হয়ে পড়ে। এর ওপর হাওড়া ও ধর্মতলাগামী বাস এবং লরি, ট্যাক্সি, ম্যাটাডোর জ্বালানির লাইনে এসে পড়লে এক বিশ্রি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো রয়েছে পাম্প সংলগ্ন ট্যাক্সিস্ট্যান্ড। তারা অপেক্ষা করে হাওড়া, বড়োবাজার কিংবা ধর্মতলার প্যাসেঞ্জার তোলার জন্য। ফলে সৃষ্টি হয় প্রবল যানজট। নাকাল হয় পথচলতি মানুষ। এ দৃশ্য প্রায় প্রতিদিনের। থমকে দাঁড়ায় রাস্তা, থমকে দাঁড়ায় স্বাভাবিক জনজীবন। তখন পায়ে হাঁটার উপায়ও থাকে না। জট কাটিয়ে একটা সাইকেলও গলে যেতে পারে না। ঠেলাঠেলি, ওভারটেক করে এগিয়ে যাওয়া, রাগারাগি তো আছেই। সময় নষ্ট হয় নিত্যযাত্রীদের, খেটে খাওয়া মানুষের অমূল্য সময় বরবাদ হয়। তখন ওই অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য কোনো ট্রাফিক পুলিশকেও পাওয়া যায় না। তারা নিজেদের হিসেব করতে একটু দূরে রেললাইনে অপেক্ষা করে। এই নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। ভুক্তভোগীরাই ভুলে যায়। নেই কোনো প্রতিবাদ, সমাধানের আলাপ।

বড়তলার কাছাকাছি পেট্রোলপাম্প বলতে মেটিয়াবুরুজের ২৮ নম্বরের পেট্রোলপাম্প। দূরত্ব ৫ কিমি। অপরদিকে তারাতলার দূরত্ব প্রায় ১৫-১৬ কিমি। এই দুই জায়গায় গিয়ে জ্বালানি ভরা বাইকওয়ালাদের পছন্দ নয়। অনেকে যেতে চায় না অন্য কারণেও। অধিকাংশ বাইকওয়ালার বয়স আঠারোর নিচে। তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। সুতরাং মেটিয়াবুরুজ কিংবা নেচার পার্ক পার হওয়ার বিপদ তারা জানে।

অনেকে আশা করেছিল, বড়তলা কলকাতা পুলিশের এলাকাধীন হওয়ায় হয়তো কিছুটা সুরাহা হবে। কিন্তু কোথায় কী! বরং বেপরোয়া বাইক চালানোয় দুর্ঘটনার ঝুঁকি শতগুণে বেড়েছে। এলাকার নেতানেত্রীরা চুপচাপ। ভোটের ঝুলিতে টান পড়তে পারে! জনৈক পথচারী সাবির আলি বিরক্ত হয়ে বলেই ফেলেন, 'ভেবেছিলাম কলকাতা পুলিশ টোটাল ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনবে। এখন দেখছি কোন এক যাদুবলে ওরা নিজেরাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে।' সকলেই মনে করেন, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। দু-একজনের মতামত, আকড়া ফটকে সরকারি ইটভাটাগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। সেই জমিতে পেট্রোলপাম্প বসালে কেমন হয়?

'এই লাইনের দু-নম্বরটা যেন আমার বাড়ির কাজে যায়'

শাকিল, সন্তোষপুর, ১৮ অক্টোবর •

সকাল সাতটা, বজবজ লাইনের সন্তোষপুর স্টেশন। ইঞ্জিনের ভারী শব্দ আরশি ভেদ করে না। বেশ শক্তপোক্ত করে আঁটা। বেলা গড়ালেও বলা যায় 'সুপ্রভাত'। তাই তাড়া নেই বাবুদের। সূর্য মাথায় উঠুক, মাথায় আছে ছাতা। ঝক্কি শুধু শেষ মুহূর্তে ট্রেন ধরা। একটু পড়িমরি করে ছোটা। সকালটা যে ওদের জন্য নয়।

সকাল তাদের, খিদের আরশিতে যাদের নাড়ি দেখা যায়। জঠরের জ্বালা আর বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তারা ভিড় করেছে ১নং প্ল্যাটফর্মে। সাতসকালেই থিক থিক করছে অশুনতি মাথা। এ মাথারা প্রতিদিনের হিসেব করে। ওদের স্বপ্নের রেশ কেটেছে অনেক আগেই। এখন পরখ করে বাস্তবকে।

দৃষ্টি ফেলতেই চোখ জুড়ে যায় রঙিন রোশনাইয়ে। ঢাকাই, জামদানি পরা বাবুদের বাড়ির মহিলারা নয়। রঙিন কমদামি ঝকঝকে সিল্ক পরা, জমকালো সব রঙ — কারণ সাদামাটা রঙ চোখকে টানে না। ঝলমল করছে সারা প্ল্যাটফর্ম। মনে হতে পারে যেন রঙের বিজ্ঞাপন চলছে। বিপণি সাজানো মলের বিজ্ঞাপন, কাঁচের বাইরে থেকেও চোখ ঝলসে যায়, মন টানে। বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ে স্বল্পবাস রমণী, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সঙ্গে বাঁকা চাহনি, মুচকি হাসি আর নিষ্ঠুর আবেদন — মনটা ছোঁক ছোঁক করে। সবটাই আছে এখানে। অন্তত স্নো-পাউডার-লিপস্টিকে চেষ্টা করা হয়েছে। পার্থক্যও আছে — বিকিনির বদলে এগারো হাত। বেশ আব্রু রক্ষিত। তবে আশপাশ থেকে উঁকি দিয়ে যায় দৃষ্টিসুখ।

বছর পঁয়ত্রিশের হাসিনা। ষোলোবিঘার রেললাইনের পাশেই ঝুপড়ি-ঘর। বর্ষায় থই থই শীতে উঁকি দিয়ে যায় কুয়াশা। হাসিনা রঙ-মিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করত। কর্মসূত্রেই অনেকের পরিচিত সে। স্বামী পরিত্যক্তা। স্বামীর রেখে যাওয়া ঘরেতেই সে থাকে দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। তাদের পেট পালতেই সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে সে। কথায় কথায় জানায় :

— আমরা রঙের কাজ করি। ঠিকেদার কালোমিস্ত্রির হেল্পার।

— শুধু কি রঙের কাজ?

— অফার এলে রঙে রঙ মেলানো হয়।

— বুঝতে পারলাম না।

জবাব না দিয়ে সে হাসে। হাসিটাই জবাব। হাসি থামিয়ে বলে —

— সবই কালোমিস্ত্রির জোগান গো। বোঝনি?

— তাহলে ফুলে প্রজাপতির ব্যবস্থা করা নাকি?

— হ্যাঁ, বাবুরা রঙ চায়, রঙিনও হতে চায়। মিস্ত্রিকে ডেকে বলে, আমার বাড়িটা নতুন, ডাগরডোগর চাই বুঝলি।

এক মাঝবয়সি বাবুকে বলতে শুনেছি — — 'এই লাইনের দু-নম্বরটা যেন আমার বাড়ির কাজে যায়।' বাবুর ফরমাস, মিস্ত্রি পালন করে।

জাহানারা, মীরা, রসিদা, লক্ষ্মী, আজমিরা, প্রতিমারা রঙের কাজ করে। সুযোগ এলে মানুষকে রঙিন করার কাজও করে। কর্ম ও ক্ষণিক আনন্দে তারা টিকে থাকে।

সকলে কাজে চলে যাওয়ার পর হাসিনা একটু ফ্রি হয়। আনমনে বলে ফেলে — — 'যাও যাও খুব মৌজ করো। তোমরাও একদিন ছিবড়ে হবে। শেষটাতে হিসেব মিলবেনি গো'। হাসিনার কাছে ওর কথা আরও জানতে চাইলে ওর দৃষ্টি চলে যায় রেললাইনের আঁকাবাঁকা পথ ধরে দূরে। ও হাতড়াতে থাকে পিছনের দিনগুলোকে।

খুনসুটি, মশকরা আর রঙিন গল্পে পার হত দিনগুলো। রাতে শুয়ে শুয়ে বুনতাম স্বপ্নের জাল। কত রাত নিমেষে কেটে যেত। টেরও পেতাম না। চোখের পাতা বুজতে না বুজতেই সকাল। নতুন ঘরে হবু স্বামীর বাহুবন্ধনে ঢলাঢলি করব, দারুণ আনন্দ হবে! সে আসবে, কখনও হামা দিয়ে, কখনও গুটিসুটি পায়ে। এলও তাই। কিন্তু আকবর বেইমানি করল আমার সঙ্গে।

স্বপ্নচোরেরা আসে জানান দিয়ে, তাদের ঠেকানো বড়ো দায়। পলকা ডাল মটকে পড়ে। সুখের প্রতিশ্রুতি টেকে না। হাসিনার জীবনের সুখের সময় তাই পলকেই হারিয়ে গেল। আলো-আঁধারের গোধূলি লগ্নে বিধ্বস্ত হয়ে ফেরাই হাসিনাদের নিয়তি। দিশাহীন পথে বেহিসেবি যাত্রা।

— ওর মন পেতে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছি। তবু পেলাম না ...

হাসিনার কণ্ঠ ফেঁসে আসে। চোখ ভরে যায় জলে। ভিজে কাপড় বারবার নিংড়ালে যেমন রঙ চটে যায়, হাসিনাদের উদ্ভিন্ন যৌবনের ভরা বসন্ত তেমনি হেমন্তের রিক্ত শূন্যতায় ভরে উঠল। সবুজ সতেজ পাতারা দেহতরু থেকে শুকনো বিবর্ণ হয়ে খসে খসে দূরে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ল। হাসিনা এখনও অনুযোগের আঙুল তোলে।

— মদ্দ মানুষের ইচ্ছার ওপর তো আমাদের জোর খাটে না। তক্ক করি, গাল পাড়ি। শেষমেষ হেরে যাই। ধরে রাখতে পারলাম না। মদ, জুয়া আর অন্য মেয়েমানুষের টান আমাদের জীবনের অভিশাপ।

স্বামীহীন সংসার নিয়ে পরিত্যক্তা নারী ভোগের সামগ্রী। তাই পাঁচজন টানাটানি করে। সেই পাঁচমিশেলি অভিজ্ঞতায় ওরা আজ বেশ টনটনে। তার স্পষ্ট ছাপ ওদের কথাবার্তায়, চালচলনে বিনা পয়সায় মিস্ত্রিরা মশকরা মারলে সুদ সমেত ফেরত দেয় ওরা — 'শালা তোর মা বোনকে ...'।

দিনের শেষে ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর হাসিনা ভাবতে থাকে সেই পুরোনো কথা। তার বাবা-মায়ের কথা। ওরা পড়াশুনা শেখাতে চেয়েছিল হাসিনাকে। খুব বেশিদূর হয়নি। আট ক্লাসে গিয়ে দাঁড়ি টানতে হয়েছে। অভাব বস্তুটা পিছু ছাড়েনি। বছর দুয়েক ঘরে বসে থাকার পর বিয়ে। এইসব সাতপাঁচ ভাবনায় রাত গড়াতে থাকে। হাসিনা জেগে জেগে দেখে হাজার ফুটো তার ঘরের চালে। সেই ফুটো দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো ঢুকে আসছে তার শরীর-মনে। সেই অস্ফুট আলোয় হাসিনা ঘরের দেওয়ালে আকবরের ছায়া দেখে। আকবর কি তাকে শুধু ঘরটাই দিয়ে গেছে? আর কিছু দেয়নি? সুখের প্রতিশ্রুতি তো দিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি এখনও বুকে ধরে রেখেছে হাসিনা। সে জানে আকবর ফিরবে, ফিরবে তার হাসিনার কাছে। অন্ধকার ঘরের ভিতর একটা জোনাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাঁদের জ্যোৎস্নার সাথে জোনাকির আলোয় ঘরের দেওয়ালে আকবর আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে হাসিনার রাতজাগা চোখে। চোখ ভরে সেই ছবি সে দেখতে থাকে। পাশের জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় ভোর।

প্রতিবেদনের স্থান, কাল, পাত্র সবই বাস্তব — — তবে তাদের বর্ণনা ও বয়ানে কিছু কল্পনার মিশেল রয়েছে।

প্রীতির পরিবার আজও বিচার পায়নি

জিতেন নন্দী, কলকাতা, ২২ অক্টোবর •

২৩ বছরের মেয়ে প্রীতি দিল্লি থেকে মুম্বাইয়ে চাকরিতে যোগ দিতে গিয়েছিল ২ মে। তাকে মুম্বাইয়ের বান্দ্রা স্টেশনে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরে মুখ ঢাকা আততায়ী তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যায়। প্রীতির চোখদুটো আর পাকস্থলী স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কে সেই আততায়ী এবং কেনই বা সে এটা করল, আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। প্রীতির বাবা অমর সিং রাঠিকে মহারাষ্ট্র সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে টাকা দিতে চেয়েছিল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্দের সঙ্গে দেখা করেন তিনি এবং সিবিআই তদন্ত করে সুবিচারের প্রার্থনা করেন। শ্রী শিন্দে আশ্বাস দেন। ইতিমধ্যে একমাস পর ১ জুন প্রীতির মৃত্যু হয়। এর চারমাস পর ২১ অক্টোবর সোমবার অমর সিং ফের শিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। শিন্দে জানান, সিবিআই তদন্ত হবে না, মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে বিষয়টি ফেরত পাঠানো হয়েছে। সিবিআই-এর কাছে সরাসরি গণ-আবেদনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের ফুলবাড়ি ও রামপাল আন্দোলনের সংগঠকরা কলকাতায়

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৪ অক্টোবর •

'আদিবাসী জনগোষ্ঠী, তা সে ভারতের হোক, বা বাংলাদেশের হোক, তারা শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাদের উচ্ছেদ করে একটা ভয়ঙ্কর কিছু হচ্ছে। সেখানে জমি থাকবে না, ফসল থাকবে না, পানি থাকবে না, গাছের পাতা থাকবে না ... পাখীরও একটা আশ্রয় থাকে, আর মানুষেরও আশ্রয় চাই ...' এভাবেই ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ফুলবাড়িতে খোলামুখ খনি তৈরির বিরুদ্ধে জনআন্দোলনের ছোট্ট বর্ণনা করলেন ফুলবাড়ি এলাকার আদিবাসী নেতা রামানু সোরেন। ২৪ অক্টোবর কলকাতায় বাংলা অ্যাকাডেমি সভাঘরে দিশা, সবুজ মঞ্চ, নাগরিক মঞ্চ, মন্থন পত্রিকা আয়োজিত সভায় আসেন বাংলাদেশের খনি বন্দর বাঁচানোর 'জাতীয় কমিটি'র আনু মহম্মদ এবং তার সঙ্গীসাথিরা। রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রবিরোধী লড়াই প্রসঙ্গে আসে ফুলবাড়ি খোলামুখ খনি বিরোধী লড়াই-এর কথা।

Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

শান্তিপুর পৌরসভার নাট্যোৎসব
‘ইস্কুল থেকে মঞ্চে’ চার বছরে পড়ল

প্রদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, শান্তিপুর, ৫ অক্টোবর •

শান্তিপুর পৌরসভা আয়োজিত চতুর্থ ‘আন্তঃ বিদ্যালয় নাট্য উৎসব’ হল বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী মঞ্চে (পাবলিক লাইব্রেরি হল)। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে শ্রী চৈতন্যদেবের হাত ধরে শান্তিপুরে শুরু হয়েছিল নাট্যাভিনয়। এরপর কত কত গুণী শিল্পী তাঁদের অভিনয় সৃজনে গৌরব দান করেছেন শান্তিপুরকে। নাট্য উৎসব ২০১৩-এর সূচনা হয়েছিল ২৫ সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল আটটায় এক পদযাত্রার মাধ্যমে। যেখানে অংশগ্রহণ করে শান্তিপুর পৌর এলাকার মধ্যেকার সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা, পৌরসভা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, শান্তিপুরের নাট্যদল ‘শান্তিপুর সাংস্কৃতিক’, ‘শান্তিপুর রসপীঠ’ ও ‘শান্তিপুর সাজঘর’। এছাড়া শামিল হয় শান্তিপুরের পৌরপ্রধান তথা বিধায়ক অজয় দে সহ পৌরসভার নাট্য অনুরাগী কর্মীবৃন্দ।

তিনদিনব্যাপী উৎসবের প্রথমদিন ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় নাট্যব্যক্তিত্ব দেবশঙ্কর হালদার প্রদীপ জ্বালিয়ে এই নাট্যোৎসব ‘ইস্কুল থেকে মঞ্চে’ উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, শান্তিপুরের এত মানুষ নাট্যচর্চা করে, কিন্তু এখানে একটা আধুনিক মঞ্চ নেই। শান্তিপুরে তাঁর দেখা ১৫ বছর আগের এই নাট্যমঞ্চ এখনও অপরিবর্তিত। একটি ভালো নাট্যমঞ্চ তৈরির প্রয়াস নিতে বলেন তিনি।

দুপুর বারোটায় ‘ম্যাকবেথ’ পরিবেশন করে তুষ্টলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। দুপুর ১টায় সূত্রাগড় এম.এন. উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্ররা উপস্থাপিত করে ‘জাবাল সত্যকাম’। দুপুর ২টোয় মঞ্চস্থ হয় সূত্রাগড় মালঞ্চ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনীত নাটক ‘যদিও সন্ধ্যা’। সন্ধ্যে ৭টায় ‘শান্তিপুর রসপীঠ’ নাট্যদল ‘হে মানুষ’ নাটকটি পরিবেশন করে।

নাট্য উৎসবের দ্বিতীয় দিনে শান্তিপুর তন্তুবায় সংঘ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নাটক ‘লঙ্কা দহন পালা’, রাধারাণী নারী শিক্ষামন্দির উচ্চবিদ্যালয় কর্তৃক উৎসবের একমাত্র ইংরাজী নাটক ‘রাইস বাউল উইসেস’ উপস্থাপিত হয়। শরৎকুমারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা উপস্থাপিত করে শেক্সপীয়ারের গল্প অবলম্বনে নাটক ‘ঝড় তুফান’, দুর্গামান শ্রী পাঠশালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা শেক্সপীয়রের নাটক অবলম্বনে ‘ভুলের মজা’ মঞ্চস্থ করে। রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শুভাশিস গাঙ্গুলির লেখা নাটক ‘যখন ডাকঘর আছে অমল নেই’ মঞ্চস্থ করে। ‘শান্তিপুর সাংস্কৃতিক’ ছোটোদের নাটক ‘আকাশে মাটিতে’ প্রদর্শিত করে।

তৃতীয় তথা শেষ দিনে শান্তিপুর মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরিবেশন করে ‘দিগন্তের ওপারে’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুইবিঘা জমি অনুকরণে)। এছাড়া শান্তিপুর হিন্দু উচ্চ বিদ্যালয়ের তরফে অভিনীত হয় ‘উল্টোপথে’ এবং শান্তিপুর ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমীর ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হয় নাটক ‘দাশুর কীর্তি’। সূত্রাগড় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বারা পরিবেশিত নাটক ‘ভেনিসের সওদাগর’ শেক্সপীয়রের কাহিনী অবলম্বনে। সন্ধ্যায় নারীর মঞ্চ অভিনীত ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ নাটকটি পৌরসভা কর্তৃক পরিবেশিত হয়।

উৎসবে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বিদ্যালয়কে ৫০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয় নাটকগুলি মঞ্চস্থ করতে সাহায্য করার জন্য। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতে স্মারক ‘স্কুল থেকে মঞ্চ’ তুলে দেওয়া হয় পুরসভার তরফে। শান্তিপুরের তিনটি নাট্যদল ‘শান্তিপুর সাংস্কৃতিক’, ‘শান্তিপুর রসপীঠ’ ও ‘শান্তিপুর সাজঘর’ এই নাট্য উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে গত একমাস ধরে।

নাট্য উৎসবে আমন্ত্রণপত্র দ্বারা শান্তিপুর পৌরসভা ৩৮০টি দর্শকাসন বিশিষ্ট নাট্যমঞ্চে উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে হতাশ হয়। বিদ্যালয়ের তরফে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশ গ্রহণ সত্ত্বেও শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতির হার ছিল নগন্য। ফলে অনেক সময় নাটক দেখতে না শেখা ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে নাটক পরিবেশনে বাধার সৃষ্টি হয়েছে যা আয়োজকদের চিন্তিত করেছে।

স্বনির্ভরতায় উজ্জ্বল ‘শিশু কিশোর বিকাশ মেলা’

এবারের শিশুকিশোর বিকাশ মেলার ছবি ফারুক-উল ইসলামের তোলা

সুব্রত ঘোষ, পাণ্ডুয়া, ২২ অক্টোবর •

স্বপ্নকে পরিপার্শ্বের কাঠ-খড়-রোদের সঙ্গে বারংবার মিলিয়ে নিতে হয়। তাই উৎসব ফিরে আসে, ফিরে আসে ‘শিশু কিশোর বিকাশ মেলা’। এবার ১৬তম শিশুমেলা অনুষ্ঠিত হল হুগলির পাণ্ডুয়ায় ইলছোবা মণ্ডলাই বালিকা বিদ্যালয়ে, ১৬ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর, ৭ দিনের জন্য। মেলায় পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলা ও প্রতিবেশী রাজ্য আসাম থেকে মোট ১২০ জন অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ৬৮ জন ছিল শিশু-কিশোর। বাকিরা ছিল বড়ো বা মেজো — যারা এই কর্মযজ্ঞ সামাল দেয় প্রতিবছর। কেউ নাটক শেখায়, কেউ গান। কেউ রান্নার আয়োজনের ব্যবস্থা করে, টাকা পয়সার হিসেব রাখে, প্রতিদিনের হাটবাজার সামলায়। আর যারা থাকে, তারা করে পর্যবেক্ষকের কাজ।

সাতদিনের এই কর্মশালায় প্রাতঃভ্রমণ, ব্যায়াম, গান, থিয়েটার, গেমস, ছবি আঁকা, লেখা, ফেলে দেওয়া কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস দিয়ে তৈরি হাতের কাজ, আমন্ত্রিত নাট্যাভিনয়, বিশিষ্টজনের সাথে মতবিনিময় ইত্যাদি প্রত্যেকবারের মতোই ছিল। আরও ছিল ছায়া নাটক নির্মাণ ও মুখোশ তৈরির দুইদিনের কর্মশালা।

উদ্যোক্তারা জানায়, এবারের মেলায় নবতম সংযোজন, ‘প্রকৃতির মধ্যে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় এরকম রঙ খুঁজে নিয়ে ছবি আঁকা, কোনো তুলি পেনসিল বা কৃত্রিম রং ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।’। এই ছবিগুলি শেষদিন সকলের জন্য প্রদর্শিত হয়। বলে না দিলে বোঝা যায় না, মাটি-ফুলের পাপড়ি, গাছের পাতা, রান্নার মশলা, চুন ইত্যাদি হাতের নাগালে থাকা নানা কিছুকে ক্ষুদে শিল্পীরা ব্যবহার করেছে আঁকার কাজে। ঝাড়গ্রাম থেকে এসেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী সঞ্জীব মিত্র মহাশয়। তৃতীয় দিন সন্ধ্যেয় তিনিই ধাপে ধাপে ছায়া নাটক অভিনয় শেখান। ওইদিন কর্মশালার শেষে ছেলেমেয়েরা নাট্যকার কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি ছায়ানাটক দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করে। পরদিন মুখোশের কাজ চলে সারাদিন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রী তীর্থঙ্কর চন্দ জানান, ‘এখানে শিশুকিশোর বিকাশ মেলায় জড়ো হওয়া কিছু শিশু কিশোরের ভিতর শুধু এক অনাবিল স্মৃতির পুঁজি তুলে দেওয়ার কাজটাই করে যাচ্ছি আমরা। এর চেয়ে বেশি আর কী করার সাধ্য আছে আমাদের!’

‘উন্নয়নকে চেনার উপায়’ — এই বিষয়কে সামনে রেখে এবারের মেলায় মোট তিনটি ছোটোদের নাটক ও একটি ছোটোবড়ো সকলের উপযোগী স্থানীয়-ইতিহাস-আশ্রয়ী নাটক বানানো হয়েছিল। ‘ব্যথা’, ‘সম্মান’ ও ‘হৃদয়পুর’ — কর্মশালার নিজেদের বানানো গল্পে এই নাটকগুলি ছোটো বড়ো সবাই দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে। বড়োদের ইলছোবার কথা নাটকটি দেখে স্থানীয় মানুষরা আপ্লুত। তারা মেলার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে যান নাটকের মাধ্যমে স্থান-নামের ইতিহাস সকলকে জানানোর জন্য।

এমন একটি উদ্যোগ নিঃশব্দে ষোলো বছর পথ হাঁটছে, একেবারেই সদস্যদের সম্মিলিত উদ্যোগ ও নিরলস পরিশ্রমে। বড়ো অর্থ-সাহায্য ও প্রচারের সুযোগকে তারা বারবার হেলায় সরিয়ে দেয় একটাই আশঙ্কায়, ক্ষমতা আর সামর্থ্যমতো এতদিনের এগিয়ে চলা যদি শেষ পর্যন্ত কাজ ছেড়ে, শিকড় ছিঁড়ে প্রচারলোভী হয়ে ওঠে! স্বনির্ভরতা তাঁদের হিমালয় লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিক। জয় হোক!

খ ব রে দু নি য়া

‘চীনারা আমাদের কোনোদিনই শান্তিতে বাঁচতে দেবে না’

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ৫ অক্টোবর •

আর এক তিব্বতীর আত্মাহুতি। চীনের জঘন্য রাষ্ট্রীয় দখলদারীর বিরুদ্ধে তিব্বতে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের ঘটনা ঘটেই চলেছে। মাঝে দু-মাসের বিরতির পর গত শনিবার ২৮ সেপ্টেম্বর দুই সন্তানের পিতা ৪১ বছর বয়স্ক শিচুঙ নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে আমদো প্রদেশের গাবা-তে। গায়ে আগুন লাগিয়ে শিচুঙ তাঁর বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তা ধরে দৌড়োতে থাকেন এবং চীনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ঘটনার কয়েকদিন আগেই তিনি তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন, ‘চীনারা আমাদের কোনোদিনই শান্তিতে বাঁচতে দেবে না’। ২০০৯ সাল থেকে তিব্বতের স্বাধীনতার জন্য এপর্যন্ত ১২২ জন গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে মারা গেছেন একশো জনের বেশি। তবু চীনের শাসকদের কোনো হেলদোল নেই। অথচ লাগাতার এধরনের ভয়ানক প্রতিবাদের ঘটনা যে কোনো মানুষকেই বিচলিত করে।

সূত্র : দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেন ফর টিবেট

‘আদিবাসীদের দাঁশাই ও কাঠি নাচ দুর্গোৎসবের বিপক্ষের নৃত্য’

মুহাম্মাদ হেলালউদ্দিন, কাশিপুর, পুরুলিয়া, ১৩ অক্টোবর •

ভারত সরকারের তফশিলি জনগোষ্ঠী সংরক্ষণের তালিকায় এক নম্বরে অসুর জনগোষ্ঠী। এরা সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার হকদার। অথচ এই জনগোষ্ঠীকে বিকৃত করে শুধু ঘৃণিত ও নিন্দিত করা হচ্ছে না, তার হত্যালীলা প্রকাশ্যে প্রদর্শিতও হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে মূলনিবাসী জনগোষ্ঠী রূপসী বাংলার বিভিন্ন জেলায় অসুর উৎসব পালন করছে। এবার ছিল তৃতীয় বছর।

অসুর উৎসবে আমরা দল বেঁধে কলকাতা থেকে পুরুলিয়া গিয়েছিলাম ১৩ অক্টোবর ২০১৩। পুরুলিয়ায় সাড়ম্বরে পালিত হল অসুর উৎসব। চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে হাওড়া থেকে প্রায় তিনশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আদ্রা থেকে দক্ষিণে ৬ কিমি, আদ্রার পরের স্টেশন আনাড়, সেখান থেকে কাশিপুর থানার অন্তর্গত ভালাগড়া গ্রাম। সেখান থেকে সোনাইজুড়ি হাইস্কুল মাঠে উৎসব।

এখানকার নবমীর দিন হুদুড়দুর্গা মহিষাসুরের (অসুর) স্মরণে মেতে ওঠেন সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল ও কুড়মী গোষ্ঠীর আদিবাসী মানুষজন। আয়োজক শিকর দিশম খেরওয়াল বীর লাকচার কমিটি।

অন্যতম উদ্যোক্তা চরিয়ান মাহাত জানান, তাঁদের বিশ্বাস, অসুর ছিলেন ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা অনার্যদের রাজা। আর্যরা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে এসে তাঁকে হত্যা করে। কৌশলী আর্যরা অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে এগিয়ে দিয়েছিল দুর্গাকে। নারী বলে অসুর তাঁকে আক্রমণ করেননি (কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে নারী-শিশু-বৃদ্ধকে আক্রমণ করা হয় না)। বিনাযুদ্ধেই মৃত্যুবরণ করেন অসুর। চরিয়ান আরও জানান, ‘আমরা মনে করি অসুর শহিদ হয়েছিলেন, তাই আমরা নবমীর দিন তাঁকে স্মরণ করে সভা করি।’

কমিটির সম্পাদক অজিত প্রসাদ হেমব্রম বলেন, আদিবাসীদের আদি পুরুষ হুদুড়দুর্গা ঘোড়াসুর তথা মহান রাজা মহিষাসুর বিদেশি আর্য রমনীর দ্বারা অন্যায়ভাবে নিধনের ফলে ভারতের ভূমিপুত্র আদিবাসী খেরওয়ালগণ দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারিয়েছিল। হুদুড়দুর্গা তথা ঘোড়াসুরকে নীতিহীন যুদ্ধে পরাজিত করে আর্যসমাজ বিজয় উৎসবে মেতে ওঠে। চারদিন ধরে দুর্গার আরাধনা করে। আর আমরা রাজাকে হারানোর দুঃখ দাঁশাই ও কাঠি নাচের মাধ্যমে প্রকাশ করি। স্মরণের সময় অতি করুণ সুরে হায়রে হায়রে শব্দ যোগে দাঁশাই ও কাঠি নাচ করি। সাঁওতালী দাঁশাই-এর বিধি অনুসারে পাঁচদিন দেবী দুর্গার মুখ দর্শনে নিষেধ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যার অসুর সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী দুর্গাপুজোর সময় বাড়ি থেকে বেরোয় না।

অনার্য আদিবাসী মূল ভারতীয়দের মুখ্য দুর্গ পরিচালনা করেছিলেন মহানরাজা ঘোড়াসুর, তাই তাকে হুদুড় দুর্গা বলা হয়। হুদুড় দুর্গা স্মরণে উপস্থিত হন হাজার হাজার আদিবাসী মানুষজন। সাম্রাজ্যবাদী আর্যদের কাছে ঘোড়াসুর অশুভ হলেও সমগ্র ভারতের ভূমিপুত্র ৮৫ শতাংশ দলিত জনগোষ্ঠী তথা মূলনিবাসীদের কাছে তিনি পরম শুভ।

এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকলিপি থেকে নিচের অংশটি উদ্ধৃত করা হল : ‘বাঙালিদের শারদীয়া দুর্গোৎসবের সময় ভারতের ভূমিপুত্র খেরওয়াল আদিবাসীদের মধ্যে, বিশেষত সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাং প্রভৃতি জাতির যুবকেরা আশ্বিনের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত দিনগুলিতে বীরঙ্গনা নারীর মতো স্ত্রীবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেরেঞ বা ভুয়াং হাতে দলবদ্ধভাবে দাঁশাই নাচ করে থাকে। তেমনি অন্যদিকে কুড়মি কোবিলার জাতিগোষ্ঠী এবং কোড়া কোবিলার, বাউরী, সহিস, মুদি প্রভৃতি ভূমিপুত্র জাতিগোষ্ঠীর যুবকেরাও একইরকম ভাবে নারী বস্ত্র পরিধান করে দলবদ্ধ ভাবে কাঠি নাচ করতে করতে গ্রামগঞ্জে ভিক্ষা করে বেড়ায়। এক্ষেত্রে সাধারণ বাঙালি থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী বাঙালিরাও ভূমিপুত্র আদিবাসীদের এইরূপ দাঁশাই নাচকে তাদের দুর্গোৎসবের স্বপক্ষে আদিবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বলেই মনে করে থাকে। এবং সেই কথা ভেবেই ইতিপূর্বে পত্রপত্রিকাতেও তারা সেইভাবেই সংবাদ পরিবেশন করেছে। কিন্তু এই নাচ ভারতের ভূমিপুত্রদের দুর্গা উৎসবের স্বপক্ষের বা আনন্দের নাচ নয়। এই নাচ দুর্গোৎসবের বিপক্ষের নাচ। ...’

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন

মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi.